# নজরুলের অস্বাক্ষরিত রচনা

লায়লা জামান*

কাজী নজরুল ইসলাম অর্ধ সাপ্তাহিক ধূমকেতু পত্রিকা সম্পাদনা করেন ১৯২২-এর ১১ আগস্ট থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।[১] এরপর থেকে অমরেশ কাঞ্জিলালের নাম পত্রিকার 'সারথি' রূপে মুদ্রিত হতো। কাজী নজরুল ইসলামের নাম ছাপা হতো 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে।

অধুনা দুষ্প্রাপ্য 'ধূমকেতু'র প্রথম বর্ষের ১২তম ও ৩১তম সংখ্যা দুটি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর মহকুমার গোকর্ণ গ্রামে 'খোসবাসপুর ফেরদৌসীয়া লাইব্রেরী'তে সংরক্ষিত আছে। আবদুর রহমান ফেরদৌসীর[২] সৌজন্যে আমরা ওই দুই সংখ্যায় প্রকাশিত তারই অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের সন্ধান পেয়েছি

[illegible] ১৩ [illegible] ১৯২২ ;

'আমার বিদ্রোহ' [illegible] নভেম্বর ১৯২২ ;

[illegible] জানুয়ারি ১৯২৩ ;

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

১ Annual Report on Newspaper & Periodicals Publication in Bengal during 1923.
উদ্ধৃত, শিশির কর, *নিষিদ্ধ নজরুল*, কলকাতা, দ্বি-স ১৯৮৮, পৃ ৯১

২ গবেষক, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, সাময়িকপত্র ও পঞ্জিকা সংগ্রাহক। প্রকাশিত বই : 'মদিনা থেকে মুর্শিদাবাদ'। তাঁর মহার্ঘ্য সংগ্রহ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন ড. মুস্তফা নুর উল ইসলাম ('সমকালে নজরুল' বইয়ে সংকলিত) ও ড. রশীদ আল ফারুকী ('বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান' বইয়ে ব্যবহৃত) প্রমুখ।

৪. 'কোথায় রাণী রাসমনি আর কোথায় পাঁচী ধোপানী', ৫ জানুয়ারি ১৯২৩।[৩]

১৯২২-এর ২৩ নভেম্বর কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলো নজরুল লিখেছিলেন বলে আমাদের অনুমান।

১৯২২-এর ২১ নভেম্বর ও ১৯২৩-এর ৫ জানুয়ারির 'ধুমকেতু'র এই দুই সংখ্যার কোন উল্লেখ আজহারউদ্দীন খান, আনিসুজ্জামান, আবদুল কাদির, রফিকুল ইসলাম মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম কিংবা মোবাশ্বের আলীর বইয়ে নেই।[৪] সারোয়ার জাহান ও আবু হেনা আবদুল আউয়াল এই সংখ্যা দুটির বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নি।[৫]

এই দুই সংখ্যার রচনা-সূচি :

**বর্ষ ১ সংখ্যা ২৩, ২১ নভেম্বর ১৯২২**

সৈনিকের পথ (অস্বাক্ষরিত), পৃ. ৩

আমার বিশ্রাম (অস্বাক্ষরিত), পৃ-৪

---

৩. ৫ জানুয়ারি ১৯২৩ সংখ্যায় মুদ্রিত অস্বাক্ষরিত রচনা 'আজ চাই কি?' (পৃ ৩-৪) 'নজরুল-রচনাবলী'র ৪র্থ খণ্ডে সংকলিত। সম্পাদক আবদুল কাদির 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' উল্লেখ করেছেন যে, 'নবযুগে' এই সম্পাদকীয় কবির স্বাক্ষরিত হয়ে মুদ্রিত। তবে তিনি সংকলন করেছেন ঢাকার দৈনিক 'ইত্তেফাক' থেকে। একই সংখ্যায় প্রকাশিত 'উল্টো সমঝায়া রাম' নিবন্ধটিকে অমরেশ কাঞ্চিলালের বলে উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি তাঁর এই ধারণার ভিত্তি কি তার কোন প্রমাণ উল্লেখ করেন নি। দ্র. 'নজরুল-সম্পাদিত ধূমকেতু ও তৎকালীণ রাজনীতি', পাণ্ডুলিপি (৭ম খণ্ড), ১৯৮০।

৪. আজহারউদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, কলকাতা, ১৯৯৭। আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র ১৯৩১-১৯৩০, ঢাকা ১৯৬৯। আবদুল কাদির (সম্পাদিত) নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), ঢাকা, ১৯৯৩। মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, ঢাকা, ১৯৮২। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'রত্নবতী' থেকে 'অগ্নিবীণা', ঢাকা ১৯৯১। মোবাশ্বের আলী, নজরুল ও সাময়িকপত্র, ঢাকা ১৯৯৪।

৫. সারোয়ার জাহান, 'নজরুল ও ধূমকেতু' *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা ১৩৯৭ পৃ. ৯৩-১০২ ; আবু হেনা অবদুল আউয়াল, 'নজরুল সম্পাদিত ধূমকেতু', *লোকায়ত*, বর্ষ ১৬ সংখ্যা ১, নভেম্বর ১৯৯৭

মুখ-খোলা (কবিতা) শিবরাম চক্রবর্ত্তী, পৃ. ৪

জীবন-মরণ আহ্বান (কবিতা) শ্রীঅতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পৃ. ৫

দ্বৈপায়নের পত্রের জবাব (অস্বাক্ষরিত), পৃ. ৫

জেহাদ (প্রবন্ধ) আল মোজাহেদ, পৃ. ৬

স্ত্রীজাতির অবনতি (প্রবন্ধ) মিসেস আর এস হোসেন, পৃ. ৭–৮

('পরিচারিকা' থেকে পুনর্মুদ্রিত)

আফগানদের 'নওরোজী গান' (কবিতা) কাজী আবদুল মতলেব, পৃ. ৯

**বর্ষ ১ সংখ্যা ৩১, ৫ জানুয়ারি ১৯২৩**

আজ চাই কি? (সম্পাদকীয়) অস্বাক্ষরিত, পৃ. ৩–৪

উল্কা (কবিতা) শ্রীঅজয় কুমার ভট্টাচার্য্য, পৃ. ৪

আত্মাকে চেনা (প্রবন্ধ) শ্রীঅবণী মোহন চক্রবর্ত্তী, পৃ. ৪

নবীন-বরণ (কবিতা) প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ. ৪–৫

মরণ-বরণ (প্রবন্ধ) শ্রী জিতেন্দ্রলাল লাহিড়ী, পৃ. ৬

উল্টা সমঝায়া রাম (সাম্পাদকীয়) অস্বাক্ষরিত, পৃ. ৬

কোথায় রাণী রাসমনি আর-কোথায় পাঁচী ধোপানী (অস্বাক্ষরিত), পৃ. ৭

ধর্ম্মগোলা (প্রতিবেদন) অস্বাক্ষরিত, পৃ. ৭–৮

'ধুমকেত'তে প্রকাশিত নজরুলের সম্পদাকীয় নিবন্ধাবলি থেকে সাতটি রচনা 'দুর্দিনের যাত্রী'[৬] (১৯২৬) ও সাতটি 'রুদ্র-মঙ্গল'[৭] (১৯২৭) বইয়ে সংকলিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্বের বিবেচনায় 'ধুমকেতু'র অগ্রন্থিত এই চারটি রচনা এখানে সংকলিত হল। অবশ্য ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছাড়াও নজরুলের এসব সাংবাদিক-গদ্য

---

৬. 'আমরা লক্ষ্মী ছাড়ার দল', 'তুবড়ী বঁশীর ডাক', 'মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা', 'স্বাগত', মেয় ভূখা হুঁ' 'পথিক। তুমি পথ হারইয়াছ' ও 'আমি সৈনিক'।

৭. রুদ্র-মঙ্গল', 'আমার পথ', 'মোহররম', 'বিষ-বাণী', 'ক্ষুদিরামের মা' ও ধূমকেতুর পথ'।

রচনার কাব্যগুণ বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মন্তব্য লক্ষ্যযোগ্য ঃ

> ধূমকেতুর সে-সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলা সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্তত সাক্ষ্য থাকত বাংলা গদ্য কতটা কাব্য-গুণান্বিত হতে পারে।[৮]

সংকলিত রচনাসমূহে লেখকের নাম নেই। তবে শব্দব্যবহার ও রচনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এগুলি নজরুলের লেখা।

আমাদের সংগৃহীত 'ধূমকেতু'র প্রতিলিপিতে কিছু কিছু শব্দ/ শব্দাংশ অস্পষ্ট। বন্ধনীতে সেসবের অনুমিত পাঠ দিয়েছি কিংবা '.(......)' চিহ্নিত করেছি।

## সংকলন

**সৈনিকের পথ।**

লক্ষ লক্ষ বিশৃঙ্খল যোদ্ধার বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সৈন্য অগ্রসর হয়, সংযত এবং শিক্ষিত সৈন্যেরাই যুদ্ধ (জয়) করে আর সংখ্যায় অধিক হলেও (শিক্ষা)-বিহীন সৈন্যদল পরাভূত হয়। শিক্ষিত সৈন্যদলের প্রত্যেকেই যে তার কাজটুকু করে মরণ তার (.......) এবং সেই পর্য্যন্ত তার স্থানটুকু (.......) করাই তার কাজ। তার পরে কি (হবে) সে ভাবনা তার নেই – তার শুধু (ভাবনা), বেঁচেই হোক আর মরেই হোক (.......) কাজটুকু করতে হবে।

(......) সমাজ কিন্তু আমরা অনেকেই স্থান (........) দিয়েছি – আমরা একটু যেতে না (যেতেই) পথের দুরত্বের কথা ভাবতে সুরু (করেছি)। আমরা একটু না এগুতেই (জিজ্ঞেস) কচ্ছি 'পথ কোথায়'?

তারা তো তা' করে নি, তারা তো কই এত ভাবে নি। দুপুর রাতে বাড়ী ফিরে এলে তাদের বাপ মা ভয়ে শিউরে উঠত, প্রিয়তম বন্ধু তাদের দূর দূর ক'রে দিত। দিন নেই, রাত নেই, তারা তো শুধু চলেই ছিল, দুর্গম পথ অতিক্রম করে ক্রমে চলেই ছিল, দেশের ভয়ে কেউ বা দেশ ছাড়া হোল – আজও কোন সুদূর প্রান্তরে

---

৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল-যুগ*, তৃ-স, পৃ. ১৩৬০, ৪৭৮

সঙ্গীহীন হ'য়ে তারা বুঝি চ'লেই যাচ্ছে। তোমরা কত সহস্র সহস্র গেলে আর এলে, তারা তো আর এল না। সেই অন্ধকার ঘরে শত্রুপুরীতে কে না খেয়ে খেয়ে ম'রে গেল তার খবর তো তোমরা রাখ না। তারা যে যৌবনে জরাগ্রস্ত হয়ে তিল তিল ক'রে মরণের দিকে চ'লেছে তা তো তোমরা ভাব না। একদিন নয় দুইদিন নয়, বছরের পর বছর তারা ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে দিনগুলি বুঝি কাটাচ্চে। কতদিন হাতকড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেও শাস্তার মনে তৃপ্তি হয় নি। তাদের হাত কেটে টপ্ টপ করে রক্ত বেরিয়ে আস্ত তবু-ও তাদের চোখ ফেটে কই জল ত বেরুত না - কেউ আপ্শোষের শ্বাস শুন্‌তে পেত না। তাদের স্থিরতা দেখে মদ মত্ত পশু-ও স্তম্ভিত হ'য়ে যেত। ওরে আমার বাংলার ছেলে, পথ চ'ল্‌তে যদি চঞ্চল হ'য়ে উঠিস্, তা হ'লে একবার তাদের কথা ভেবে নিস্, ছিল চারদিকে অন্ধকার সেই অন্ধকারে সঙ্গীহীন হ'য়ে তারা ধীর চিত্তে মরণের পথে চ'ল্‌তো। ওরে পথিক, পথের ভাব্‌না করা তোর চ'ল্‌বে না। তুই শুধু এগিয়ে চল্। সেই গৃহ-ছাড়া লক্ষ্মীছাড়াদের মত এগিয়ে চল্। আজ যে ব্যথা ব্যথী করুণ কণ্ঠে তাঁর দুঃখ জাগিয়ে তোদের প্রাণে অলসতা আর অবসাদ এনে দিচ্ছে, তার দিকে ভাঙা বুকখানি ফিরিয়ে দিয়ে বল "ওগো করুণাময় তুমি তোমার আরামের বোঝা নিয়ে ঘরে ফিরে যাও! আমার ভবিষ্যত নেই, আমার আশা নেই - আমার ভয় নেই। দারিদ্র্য আমার বন্ধু - দীর্ঘশ্বাস আমার পুরস্কার! অন্ধকার আমার পথ, মরণ আমার লক্ষ্য।"

জাগো, আমার হৃদয়ের সৈনিক, জাগো। বিশ্বময় রণডঙ্কা বেজে উঠেছে। বিশ্বময় কোটী কোটী প্রাণকে নীচে চেপে রাখ্‌বার শেষ চেষ্টা চ'লেছে। দেশে দেশে পীড়িতের ক্রন্দন গুম্‌রে গুম্‌রে উঠ্‌ছে - কোটী কোটী চোখের জল জমাট্ হ'য়ে গেছে। ওঠো, আমার সুপ্ত সেনা, তুমি তোমার তপ্তশ্বাস নিয়ে ওঠো, বুকে বুকে তোমার প্রাণের আগুন জ্বালিয়ে দাও। শোন, একটু স্থির হ'য়ে শোন, অদূরে কাদের রণ-কোলাহল শোনা যাচ্ছে। ঐ শোন কারা যুগযুগান্তরের আচারকে চুরমার ক'রে দিচ্ছে - তারা অত্যাচারী সমাজকে হত্যা ক'রে ফেলেছে। আর তুমি? সমাজ তোমার প্রভু, আচার তোমার কারাগৃহ, কাজী আর ব্রাহ্মণ তোমার প্রহরী। তুমি কি বেঁচে আছ? তোমার-ই ঘরে, এসে তারা তোমাকে বুকে দলিয়ে, তোমার প্রিয়তম গুলির রক্তপাত ক'রে বুক ফুলিয়ে ফিরে যায়, আর তুমি চুপ ক'রে পড়ে থাক! তবুও বল, তুমি মানুষ! তোমার ছোট ঘরখানি যখন ভেসে গেল, তোমার স্নেহের শিশুটা যখন না খেয়ে খেয়ে মারা গেল, তখন-ও তারা তোমারই রক্তে তেজীয়ান্ হয়ে তোমার বুকে চেপে বসে থাকে, তবু-ও তুমি বেঁচে আছ?

ওগো সৈনিক, তোমার ক্লীবতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে হুঙ্কার ক'রে ওঠো। আজ যারা তোমার জন্যে তারা ব'সে আছে। তারা আর তো ব'সে থাকতে পারে না—তারা আর তো চুপ করে মরতে পারে না। চেয়ে দেখ তাদের চোখে আর জল নেই—আগুন ঠিক্‌রে পড়্‌ছে। তাদের হৃদয়ে আর দীর্ঘশ্বাস নেই—ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরুচ্ছে।

ওগো বীর তুমি তাদের আগুন বুকে ক'রে নাও—দীপ্ত জীবনের পথে এগিয়ে যাও। পথের কথা তোমার ভাবতে নেই—তুমি শুধু তোমার সহযাত্রীদের নিয়ে ঠিক হয়ে থাকো। যেদিন নেতার আহ্বান কানে আসবে সেদিন মুহূর্ত্ত-মধ্যে ভেতর বাইরের সব বাঁধন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তার পতাকা-তলে গিয়ে ভিড়ে যেও। কোন বীর হেরে গেল, কোন্ বীর আবার তাঁর স্থান অধিকার ক'র্‌ল, সে ভাবনা তোমার থাক্‌বে না। নিশান হাতে নিয়ে যে বীর এসে তোমায় আহ্বান ক'র্‌বে, তুমি তোমার সঙ্গীগণ নিয়ে তারই পাশে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌বে "আমি প্রস্তুত।"

তারা পথ নিয়ে ভেবে মরুক, তোমার পথ-চিহ্ন গৈরিক নিশান ; তোমার আনন্দ দুন্দুভিধ্বনিতে, ঘাত প্রতিঘাত তোমার নিত্য সাথী, মৃত্যু তোমার পুরস্কার।

## আমার বিশ্রাম

এস কর্ম্মের দুরন্ত উন্মাদনা, আমার প্রতি তন্ত্রী, গ্রন্থী মেদ মজ্জায় আমাকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে। এস বিশ্ববিচূর্ণকারিণী শক্তি, আমার প্রতি পেশীকে ইস্পাতে পরিণত ক'রে তাদিগকে অবিশ্রান্ত নাচিয়ে দিতে। কোথা ভৈরবী মা আমার ! মেঘমন্দ্রে আমার কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে এস তোমার ভীষণ বিষাণ বাজিয়ে। মহামায়া, তোর মদালসা স্নেহের আঙ্গুল যেন কক্ষণো আমার এ বাজে পোড়া দেহে বুলোস্‌নে ; জ্বলে যায় তোর স্নেহের প্রলেপে। আয় মা দুর্দ্ধর্ষা রুদ্রাণী বিজ্‌লীর ফিনকী মেরে দিন রাত আমার ধমনীগুলোকে সজাগ্ রাখ্‌তে। নিদ্রা? হতভাগী, দূর হ তোর চামর দুলোনো ঢুলুঢুলু আঁখি নিয়ে। হো-হো-হো মরণ সাঙ্গিনী, বিশ্রাম দিতে আস্‌ছ কাকে? যার মায়ের, বোনের, ভায়ের পেটে অন্ন মুষ্টি নেই, যার শীতের রাতে চার আঙ্গুল ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া জোটেনা পিঠের পরে দিতে, যারা মরণের সাথে যুঝতে অক্ষম বনের পশুর মত নরখাদকদের শিকার হ'য়ে চোক্ বুজে শরীর ছেড়ে দিয়েছে, তাকে? যাকে শেয়াল, শকুনের মত ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিল তিল ক'রে সভ্য পশুরা বাসি ক'রে রেখে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে খাচ্ছে, তাকে? প্রিয়জন সঙ্গসুখ কাকে দিতে চাইছ, বিস্মৃতিদায়িনী? যার

প্রতিবেশী অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুল্‌তে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে, যে পরের রক্ত আঁখির ভয়ে নিজের কাপড় নিজে তৈরি করতে ভয় পায়, যার ছেলে ম'রে পড়ে থাক্‌তে মরণ-কর দিবার বিরুদ্ধে, ছেলে জন্মালে একটু আনন্দ ক'রতে গেলে আমোদ-কর দিবার বিরুদ্ধে একটী কথা ব'লতে সাহসী হয় না সেই ইহ্ পরকাল হীন বর্ব্বরকে? দূর কর্ তোর জীবনঘাতিনী মায়া, আর পারিস্ ত আয় খর্পরকরবালিনি, সুয্যিকে পুড়িয়ে মারবার মত আগুনের ঝলক দেওয়া রূপের ছটাতে আমার শোণিত কণাগুলো টগ্‌বগ্ ক'রে বাষ্প ক'রে দিয়ে আমাকে সাইক্লোনের বেগে, ঘূর্ণাবর্ত্তের গতিতে দুনিয়াময় ঘুরিয়ে খাটিয়ে নিতে। পারিস্ তার ভীম তরবারির একটা খোঁচা বেচারী ধরণীর বুকে আমূল বিঁধিয়ে তার তাজা রক্তে আমার এ সাগর ভরা পিপাসা মিটিয়ে দিয়ে, আমার অশান্ত মাথার উপরের চুলের রাশ'টাকে মানুষের গতির সঙ্গে দুলিয়ে দিয়ে মস্তিষ্ক একটু তাজা ক'রে দিতে। পারিস্ গোড়ালীতে আমার এমনি বল দে যেন লাথিতে দুনিয়ার অত্যাচার দানবকে হীনা স্থবিরা ধরণীর পাঁজরা ভেঙ্গে ক্রোশ নীচে দাবিয়ে দিতে পারি। ... তো ডানা দুটোয় এমনি জোর দে ..., যেন দক্ষিণ মুখো হ'য়ে দুঃশাসন ধরা ঠ্যাং দুটো ধ'রে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ছুড়ে ফেল্‌তে পারি আর সে ঝলকে রক্ত বমি ক'রতে ক'রতে দক্ষিণ মেরুর কুয়াসাময় বরফের ভেতর পুঁতে চিরদিনের মত অদৃশ্য হ'য়ে যায়। আর যদি না পারিস্ তা, তবে দূর হ্ তোর অবিদ্যার রূপরাশি নিয়ে আমার চোখের সুমুখ থেকে নৈলে হাজার বছর তোর এলোচুলের রাশ ধ'রে ঘুরিয়ে জাহান্নমের পুতিগন্ধময় অন্ধকারে তোকেও পুঁতে ফেলে, সেই শ্মশানের উপর চিরকাল আমার আগুনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে নাচ্‌বো। আমি অনাদি, আমি অশেষ ; বিশ্রাম আমার সেই দিনই হবে শুধু, যেদিন হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে অত্যাচার অত্যাচারিতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে তার পাওনা গণ্ডা ফিরিয়ে দিয়ে স'রে দাঁড়াবে আর সজল চোখে হাসিমুখে আমার শিশুকোমলপ্রাণ ভাইরা তাদের ক্ষমা ক'রে কোলে তুলে নেবে।

## উল্টা সমঝায়া রাম

এ পোড়া দেশের বোকা-রাম আমরা চিরকালটাই উল্টা বুঝে আসছি। সুতরাং এবারেও যে সনাতন রীতির ব্যতিক্রম হবে না, এ কথা অনেকেই বুঝেছিলেন, এবং তাতেই কংগ্রেসের গয়া-কৃত্য এবার গয়াতেই হবে এ বিষয়েও হাজার হাজার চিন্তাশীল আগে থেকেই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন।

হলোও ঠিক তাই। এজাতটার মস্তিষ্কে কোথায় বিধাতা একটা গোবরের থকে বসিয়ে দিয়েছেন যার জন্যে তার বুদ্ধি পেকে উঠি-উঠি হ'তেই আবার কাঁচিয়ে যার, এ কাঁচা আর পাকতেই চায় না।

এত দিন ধরে এই দারুণ ঢাক ঢোল পিটিয়ে কংগ্রেসের দলাদলির মচ্ছবেও ধূমকেতু একটী কথাও বলেনি। দু-এক জন বাইরের লেখক ও সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তাতে আমাদের মতামতের অপেক্ষা না রেখে দু-পক্ষেরই কথা হুবহু পত্রস্থ করেছি, এখনও করব। আমরা কোনো দলেই নাই ; আমরা সবারই চক্ষুশূল আছি এবং থাকবো, তাইই আমাদের বিশেষত্ব ও গৌরব। সুতরাং সববারি কথা শুনবো। ও সবাইকে শোনাব, তার ভালমন্দ আমাদের কাঁচা মনে কেমন ছাপ কখন দেয়, তাও প্রকাশ করবো। কেবল বুরোক্রেসীর কোনো উপদেশ শুনবো না, অত্যাচারে দমবো না, দয়ার সাগরে ভেসে যাব না। কারণ দুনিয়ার স্বদেশী-বিদেশী কোনো বুরোক্রেসীই স্বাধীনতা দেয় না এ জন্য ঐ সব ক্রেসী-ফ্রেসীর সঙ্গে আমাদের কোনো রফাও নেই, ওদের উপর বিশ্বাসও নেই।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণের পর থেকে মুক্তিকামী দল এক সঙ্গে এক টানাই স্বরাজের পথে চলেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁরা ভাবেন নি যে মহাত্মাকে যদি জেলে যেতে হয়, তা হ'লে তাঁরা কি করবেন। মহাত্মার কার্য্য প্রণালী অনবরতঃই ছিল পরিবর্ত্তনশীল। যাঁরাই সজীব, তাঁরাই পরিবর্ত্তন চান, চলনই সজীবতার লক্ষণ একথা সব্বাই জানে। মহাত্মার কারাবাসের পর তাঁর অতি গোঁড়া ভক্তরা—মহাদেব, শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণের ভক্তেরই মতে তিনি যে পথ র'চে গিয়েছেন তাতেই চলতে দাঁতে দাঁত চেপে, বজ্রমুষ্টি ক'রে ভন (?) ফেল্‌তে লাগলেন। তাদের মরণ কবুল পণ হ'ল ৫ গোঁসাই যা রচে গেছেন, তা থেকে গড়লেই অনন্ত নরক।"

গোঁসাই যে মাসে মাসে নতুন পথ রচতেন, তার কথা উঠলেই বলা হয়, যে রচতেন 'তিনি' আর এ যে আমরা হরিবোল হরি ! এত কাল 'ব' এ হ্র' কার 'ই' কার, 'ড়' এ 'আ'কার এবং 'ই'কার পড়িয়ে পড়িয়ে উচ্চারণের বেলায় হ'ল-সেই সনাতন 'বলেই' ! এ কি সর্ব্বনেশে মোহ! মহাত্মাকে মানা হবে, কিন্তু তার আদেশ মানা হবে না, এভাবটাও হয় অজ্ঞাত ভাবে এই একগুয়ে উল্টা সমঝানো রামেদের মস্তিষ্ক আছে। থামো রা রা ক'রে ঠেলে উঠতে হবে না, বুঝিয়ে দিচ্ছি। মহাত্মা যাবার বেলায় যে সকল নেতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে চলে গিছলেন যে তাঁরাই আমার স্থানে এখন কাজ চালাবেন, আমরা সেই আদেশ অমান্য করিনি? আসল কথা হ'চ্ছে

যেখানে কিছু করবার এবং সেই করার ফলে সামনে বিপদ আসবার ভয় আছে। আমরা চির দিনই এড়িয়ে যাবার জন্যে লেপ মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়েছি এবার শুলেম। দেখি কে আমাদের ঘুম ভাঙ্গায় এ শোয়া থেকে আর ভগবান জানেন কখনো উঠবো কি না। খবরদার। চুপ রহো—দেখিয়ে দিচ্চি কেমন ক'রে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। 'গত বছর হস্‌রত মোহানির প্রস্তাব পাগলামি বলে কারা উড়িয়েছিল? এবার কাউন্সিল ভাঙ্গা সংগ্রাম থেকে আত্মরক্ষা করে লেপ মুড়ি দিয়ে মহাত্মার নাম জপ করবার ভান কারা করলো? আমরা,—হতভাগা ভীরু কাপুরুষের দল—আমরা! আমরা যখন দেশের কিছু হবার মত সময় হয়ে আসে মরা জাত আগলিয়ে বসে থেকে থেকে কালে ভদ্রে যখনই এক আধটা প্রাণ কাজ করবার জন্যে এগিয়ে আসে, তখনই আমরা পাছে সামনে গোলমাল আসে, সনাতন অলস দেহটা নড়াবার কষ্ট থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে তখনই আমরা এই নাম জপের ভান ধ'রে দিই। দেখবে মহাত্মার আর তারত্বের প্রমাণ প্রয়োগ সহ শত শত লেখা, মহাত্মার যুগলরূপই গোবর্দ্ধন ধারী মহাত্মা, গোচারক মহাত্মা শ্রীভঙ্গ বংশীবাদক মহাত্মা, চক্রধারী মহাত্মা এমনই শত শত মূর্ত্তি মহাত্মা বেঁচে থাক্‌তেই তাঁকে পূজা করেই প্রসাদ মেরেই তাঁর আরব্ধ সব লড়াই ফতে করবার জন্যে আমরা কাতার দিয়ে টিকি দুলিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছি, আর আমাদের পায় কে?

## কোথায় রাণী রাসমণি

## আর—

## কোথায় পাঁচী ধোপানী

সারথি সম্পাদক ভায়া, দেখলাম বোমার আসামী উল্লাস কর দত্তকে নির্য্যাতিত রাজনৈতিক বন্দীরূপে বিনা পয়সায় কংগ্রেস দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে, তুমি তোমার "ধূমকেতুর" স্তম্ভে অনেক খানি অভিমান বর্ষণ করেছো। উল্লাসকর জেলে গিয়ে পাগল হয়ে গেলেন, বোধ হয় তাঁর সেই পাগলামির [.....] এখনও সম্পূর্ণ কাটেনি ; নইলে তিনি নির্য্যাতিত রাজনৈতিক বন্দী সেজে বিনা পয়সায় কংগ্রেসে ঢুকবার অনুমতি চাইতে যান কি সাহসে?

উল্লাসকর পাগল হন, আর যা খুসী পাগলামী করুন তাতে আমার বড় একটা যায় আসে না ; কিন্তু তুমি আমার বহুকালের বন্ধু, তোমার পাগলামি দেখে মনে বড়

কষ্ট পেয়েছি। তোমায় পাগল বলছি কেন জান? যদি বুঝতে না পেরে থাক, তবে শোন। তুমি একটা বিচক্ষণ লোক হয়ে, বোমার আসামী উল্লাসকর দত্ত হিংসা দ্বেষ বিবর্জ্জিত নির্য্যাতিত অহিংস অসহযোগী রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে সমান অধিকার পায়নি বলে দুঃখ কর? সাবাস তোমাকে, আর সাবাস তোমার দুঃখ করবার হেতুকে! কোথায় রাণী রাসমণি, আর কোথায় পাঁচী ধোপানী!

চাঁদের সঙ্গে তুলনা জোনাকী পোকার! উল্লাসকর দত্ত, কানাই দত্ত, সত্যেন বোস প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বোস, এরা তো সব খুনে গোণ্ডা, এরা সংসার ধর্ম্ম ত্যাগ করে, পিতামাতা, আত্মীয় বন্ধুদের মায়া কাটিয়ে, দয়া মায়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, জীবন মরণ পণ করে শুধু গুণ্ডামির জন্যেই—দেশের জন্যে নয়—বোমা পিস্তল গোলা বারুদ নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন, তার ফলে তাঁরা পেয়েছিলেন ফাঁসী, জেল, সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয় ও অশেষ কষ্ট, দেশ সেবকদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের জন্যে আত্মত্যাগের কোনওরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারেন নি কিন্তু অহিংস অসহযোগকারী বীর কংগ্রেসের (কংগ্রেসের মতে "বীর" আখ্যা এদেরই প্রাপ্য) দেশ সেবকেরা, অক্লান্ত পরিশ্রম করে "দেশ মায়ের" সেবা করেছেন ও করছেন, কত [......] ধনী দরিদ্র অনন্য সাধারণের নিকট থেকে চাঁদা তুলেছেন, মাথা খাটিয়ে, বুদ্ধি খরচ করে তা ব্যয়ও করেছেন, আর সে ব্যয় শুধু স্বরাজের (স্বরাজের ব্যাখ্যা পরে দিলাম) জন্যে? এই বীরগণের অক্লান্ত চেষ্টা ও আত্মত্যাগ বিফল হয়নি। গত এক বছর থেকে তাঁদের (অহিংস অসহযোগীদের) ভিতরে ভিতরে স্বরাজ এসেছে, ভায়া, তোমার আমার মত স্থূল বুদ্ধির লোকে তা জানতে বা দেখতে না পেলেও স্বরাজ যে এসেছে তাহাতে সন্দেহ নেই। এ স্বরাজ বাইরের জিনিষ নয় (বাহিরে বেরোয় তখনই যখন নেতায় নেতায় ঝগড়া বাধে, কিম্বা অজ্ঞ দেশবাসীগণ সংগৃহীত চাঁদার টাকা কি কাজে ব্যয় হলো তা জানতে চায়) বা এ স্বরাজ তোমার আমার জন্যে বা দেশের জনসাধারণের জন্যে আসে নি, এসেছে শুধু আত্মত্যাগী অহিংস অসহযোগীদের জন্যে।

তোমার উল্লাস কর দা যে কেন এই সব বীর দেশ সেবকদের সঙ্গে সমান অধিকার পান নি তা বুঝেছ তো? যদি না বুঝে থাক তবে আরও স্পষ্ট করে বলি শোন; উল্লাস করের দল চেয়েছিলেন মার পিট করে ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়িয়ে, দেশ স্বাধীন করতে, আর অহিংস অসহযোগীরা চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন কেন, পেয়েছেন—স্বরাজ। "স্ব" মানে নিজ বা নিজের রাজত্ব বা নিজের কর্ত্তৃত্ব। এখন

বুঝলে তো, এই উভয় দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শে কত প্রভেদ? একদল চান 'জনসাধারণের স্বাধীনতা, আর একদল চান 'স্বরাজ অর্থাৎ নিজেদের কর্ত্তৃত্ব।'

স্বরাজ পন্থী অহিংস অসহযোগকারীগণ, তাদের লব্ধ স্বরাজকে বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তাই তাঁরা খাদ মেশাতে চান না খাঁটি সোনার সঙ্গে, তাই উল্লাস কর কংগ্রেসে ঢুকবার অধিকার পাননি। ভায়া যদি তোমার এতটুকুন আক্কেল বুদ্ধিও থাকতো তা হলে তুমি অত কাঁদুনি গাইতে না। আর তোমাকেই বা বলি কি? দেশের লোকগুলিও তো পাগল। নৈলে গুণ্ডার দণ্ডের কানাই দত্তের ফাঁসির দিনে, তাঁর মৃতদেহের পায়ের ধূলো নেবার জন্যে ধনী, দরিদ্র ইতর ভদ্র, শতে শতে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে লোক "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে দিগ বিদিগ কম্পিত করে ছুটবে কেন? নইলে কেনই বা পাগল লোকগুলো কানাইয়ের শব, পুষ্প চন্দনে ভূষিত করে নিজেদের ধন্য বলে মনে করবে! কানাই দত্ত তাঁতীর ছেলে, শত সহস্র টিকিওয়ালা গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও সেদিন সেই তাঁতীর ছেলের পায়ের ধুলো নিয়ে ধন্য হয়েছিল। আজও দেশের পাগল লোকগুলি তাঁর জন্যে, তাঁর দলের লোকগুলির জন্যে চোখের জল ফেলে। কিন্তু হলে হবে কি? তাঁরা স্বরাজ পন্থী নয়, সুতরাং স্বরাজ পন্থীদের সঙ্গে সম্মান পাবে কি করে? আমার এক রসিক বন্ধু রসিকতা করে বলেছিলেন "তেলাপোকা পাখি হলো, সবরেজিষ্টার হাকিম হলো।" বন্ধুর রসিকতা যে সত্যে পরিণত হবে তা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি। যেন দেখছি সত্যিই তেলাপোকা গুলি পক্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আর তারা উড়তে আরম্ভ করেছে, নইলে দেশময় এত বোঁটকা গন্ধ কিসের?

এতেও যদি না বুঝে থাক কেন উল্লাস কর কংগ্রেসে প্রবেশ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তাহলে আরও একটু শোন। উল্লাস কর যে গুণ্ডার দলের লোক সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। তাঁর উদ্দেশ্য ও আদর্শ যে ভাল নয়, তাও বলেছি; কিন্তু অহিংসে অসহযোগকারী বীরগণের উদ্দেশ্য অতি মহান, আদর্শ অতি উচ্চ তাঁরা মার খেয়ে ফিরিয়ে মারতে জানে না। মার খাওয়া তাঁদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম, মারা তাঁদের স্বভাব বিরুদ্ধ। দ্বেষ হিংসা তাঁদের নাই। পাছে হিংসা এসে পড়ে এই ভয়ে বীরগণ, কংগ্রেসে বিলাতী পণ্য বিসর্জ্জনের প্রস্তাবটা ত্যাগ করেছেন। তাঁরা নিজেরা তো স্বরাজ পেয়েছেনই, দেশের লোককেও উপদেশ দিচ্ছেন কলসীর কানা মারলেও প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হয়ো না, কিন্তু যতক্ষণ না ইংরেজ জোর করে সহযোগ না করে ততক্ষণ সহযোগ করো না, তাহলে দেখবে যে ইংরাজকে তোমরা শত্রু মনে কর তারা মিত্র

হয়ে উঠবে, আর বিনা গণ্ডগোলে স্বরাজ তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে লক্ষ্মীছেলের মত জাহাজে চড়ে বিলাত চলে যাবে, স্বরাজ পেলে তখন যা খুসি করতে পার। যাদের উপদেশ এমন যুক্তিপূর্ণ, আদর্শ এমন উন্নত ও পবিত্র, কার্য্যপদ্ধতি এমন সরস ও সহজসাধ্য তাঁদের সঙ্গে বোমার আসামী উল্লাস কর সমান অধিকার পায় নি বলে তুমি দুঃখ কর? বুঝি এই জন্যেই তোমায় পাগল বলে লোকে?

ঐ উম্মাদদলের এক ভূতপূর্ব গুণ্ডা।